আরব- ভূমিতে গ্রীক দর্শনের পঠন- পাঠন, আরবের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ইসলামের উদ্ভব ও কোরআনঃ ইতিহাসের পাঠ থেকে একটি বিশ্লেষণ

নাস্তিকের ধর্মকথা

একঃ

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেলে তার শাসনভার মিশরীয় সেনাপতি টলেমীর অধিকারভুক্ত হয়। তখন থেকে ৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত টলেমীর বংশের অধীনে থাকে এবং ক্রমশ মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া ব্যবসাকেন্দ্র ব্যতিত বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে দ্বিতীয় এথেন্সে পরিণত হয়। রোমে খৃষ্টধর্মের প্রচার যখন তুঙ্গে তখন গ্রীক দর্শনের পঠন- পাঠনের শক্তিশালি কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়া।

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক ফিলো- জোডাস(২৫- ৫০ খৃষ্টপূর্ব), প্লটিনাস (২০৫- ২৭১ খৃষ্টাব্দ)- উভয়েই রহস্যবাদী নব্য প্লেটোনিক দর্শনের অনুগামী ছিলেন, পঠন- পাঠনে এরিস্টোটলের গ্রন্থকেও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

প্লটিনাসের ছাত্র ও পরবর্তিতে দর্শনের অধ্যাপক পারফিরিয়াস (জন্ম ২৩৩ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ায়) এরিস্টোটলের গ্রন্থের বিবরণ ও ভাষ্য রচনা করেন। তর্কবিদ্যার ছাত্রদের জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থ ইসাগোজী- আজও বিভিন্ন আরবী মাদ্রাসায় অবশ্য- পাঠ্য পুস্তক।

দুইঃ

খৃষ্টধর্ম অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্মের মতোই দর্শনের বিরোধী ছিল।
৩০০ খৃষ্টাব্দে পাদরী থিওফিলাস আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ভস্মীভুত করেন এবং ৪১৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানগণ আলেকজান্দ্রিয়ার বিদূষী গণিতজ্ঞ হাইপেনিয়াকে নির্মমভাবে বধ করে, ৫২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা জাস্টিনিয়ান দর্শনের পঠন- পাঠন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন। (এভাবে মানুষের চিন্তাজগতের তথা জ্ঞানে- বিজ্ঞানে- বিভিন্নক্ষেত্রে যে দারুন অগ্রগতি আমরা দেখি গ্রীক- রোমান- মিশরীয় পটভূমিকায়- তাকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়; সে ক্ষতি মানবজাতির ইতিহাসে অপূরণীয়- উল্টোদিকে- আমাদের এ ভারত মহাদেশের পটভূমিকায় উজ্জয়িনির ভূমিকাও কিন্তু স্তব্ধ হয়- এখানে মুসলমানদের আগমনের ও তাদের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পথ ধরে- এটার ক্ষতি- আমরা আজ পর্যন্ত পূরণ করতে পারিনি!!)

তিনঃ

দর্শনদ্রোহী জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল থেকেই রোম- সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তার প্রতিবেশি দেশ ইরাণ। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে ৭ জন নব্য প্লেটোনিক দার্শনিক(ডায়োজেনিস, হারমিয়াস, ইউলেলিয়াস প্রমুখ) এথেন্স থেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ইরানের নৌসেরবান(নতুন শাহ) খশরু তাদের আশ্রয় দেন; যদিও এতে নৌসেরবানের আন্তরিকতার চেয়ে রোমান কাইজারের বিরোধীদের আশ্রয় দেয়ার অভিসন্ধিই প্রধান ছিল।

নৌসেরবান জন্দেশাপোরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যেখানে বিশেষভাবে দর্শন ও চিকিতসাশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হতো। এ ছাড়া কিছু গ্রীক দর্শন- গ্রন্থের এবং অন্য কিছু গ্রন্থেরও অনুবাদ হয়েছিল।

পৌলুস পার্সা অনুদিত এরিস্টোটলের তর্কশাস্ত্রের কথা জানা যায়।

চারঃ

খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই বিশ্বের বাণিজ্যক্ষেত্রে সিরিয়ার বনিকদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ইরাণ, রোম, ভারত ও চীন- পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং পশ্চিমে ফ্রান্স পর্যন্তওবাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল।

বাণিজ্যের সঙ্গে ধর্ম- সংস্কৃতিরো আদান- প্রদান হয়, ফলে- তাদের সঙ্গে গ্রীক দর্শনও প্রচারিত হচ্ছিল। সিরিয়ান পন্ডিতগণ গ্রীক দর্শনকে আলেকজান্দ্রিয়া ও আন্টিয়োক থেকে তুলে এনে ইরাণ (জান্দেশাপোর), মেসোপটেমিয়া ও নিসিবী পর্যন্ত প্রচার করেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মেসোপটেমিয়ায় প্রচুর গ্রীক দর্শন ও শাস্ত্রীয় পুস্তকের অনুবাদ হয়েছিল। এসব অনুবাদে সর্বত্রই মূলকে অনুসরণ করার চেস্টা করা হয়েছিল, শুধু গ্রীক মহাপুরুষ ও দেবদেবীগণের পরিবর্তে খৃষ্টান মহাপুরুষের নাম করা হয়।

পাঁচঃ

ততকালীন আরব প্রধানত মূর্তি পুজক ও বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু, এটাও ঠিক যে, সেসময়ে আরবে খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মেরও প্রসার ঘটেছিল।

আরব জাতি অনকেগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি বা গোত্রে বিভক্ত ছিল। আরবদের মূল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল-

১। পশুপালন,

২। লুঠতরাজ,

৩। বাণিজ্য,

৪। মক্কার কাবাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বাতাবরণে (মূর্তি পূজা)- উতসব, মেলা, ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড।

সে সময়, স্বাভাবিকভাবে, বণিক অংশই ছিল সমাজের এগিয়ে থাকা মানুষের প্রতিনিধি। এবং তাদের এ ব্যবসা- বাণিজ্য নির্বিঘ্ন ছিল না।

উপরন্তু, এই বণিক শ্রেণীটিকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া, ইরাণ, রোম সহ দেশ- দেশান্তরেও পাড়ি জমাতে হত। এদের মাধ্যমেই আরবে- জ্ঞানতত্ত্বের প্রসার ও বিকাশ ঘটেছিল।

আর আরব অঞ্চলে গ্রীক দর্শনের শুধু প্রচার নয়, একটা জনপ্রিয়তাও ছিল। তা মূলত প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে এই বণিকগোষ্ঠীর হাত ধরেই আরবে ঢুকে।

ছয়ঃ

মুহাম্মদ সা. জীবনী হতে দেখা যায়ঃ

-> ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কার কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

->বাল্যকালেই তিনি পিতামাতাহীন হন, এবং পিতৃব্য ও পিতামহের কাছে লালিত- পালিত হন।

-> বালক বয়সেই তিনি তাঁর চাচার হাত ধরে বাণিজ্যযাত্রায় অংশ নিয়ে প্রতিবেশি দেশসমূহে গমন করেন।

-> তিনি নিজেও ব্যবসা- বাণিজ্যে যুক্ত হন।

->তিনি নিরক্ষর ছিলেন- এ কথা আংশিক সত্য। মানে, তিনি শুধু লিখতে ও পড়তেই জানতেন না- কিন্তু, বাল্যকাল থেকেই প্রতিবেশি দেশসমূহের উর্বরতা- রুক্ষতা, সেখানকার বিভিন্ন ধর্মের রীতি- নীতি তথা নানা জীবন- প্রণালী তথা জীবন দর্শন সম্পর্কে গভীর নিরীক্ষণের সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

-> যুবক বয়সে সম্ভ্রান্ত খাদীজা তাঁর তীক্ষ্ণ বাণিজ্য- নৈপুন্যের কথা শুনে তাঁকে নিজ কারবারের প্রধান মুখিয়ার পদ দিয়ে বাণিজ্যে পাঠান।

->নিজে বণিক হওয়ায়, সে সময়ে আরবের এগিয়ে থাকা অংশ অন্যান্য বণিকদের সাথেও তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল।

->নিজ গোত্রের পৌত্তলিকদের সাথেই শুধু নয়, খৃষ্টান ও ইহুদীদের সাথেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তাদের কাছে থেকে তিনি সেসব ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেন।

->৪০ বছর বয়সের আগে তিনি নিজেকে ধর্ম প্রচারক দাবি করেননি।

->এ সময়কালে বণিকী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাঁকে ততকালীন আরব সমাজ নিয়ে গভীর চিন্তা করতে দেখা যায় ও নানাধরণের কাজ- কর্মে অংশ নিতে দেখা যায়।

->সেই বহুধাবিভক্ত বর্বর আরব জাতি তথা আরব সমাজকে পাল্টানোর তাগিদ, মুহাম্মদ সা. এর থেকে আরম্ভ নয়।

->মুহাম্মদ সা. এর জন্মের আগ থেকেই এ ধরণের ক্রিয়াকলাপ সেখানে দেখা যায়।

->মুহাম্মদ সা. ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারি এবং আরব সোসাইটির অনেক কিছুই তিনি মেনে নিতে পারেননি, বা তার পরিবর্তন মনে প্রাণে চাইতেন।

->বণিক হিসাবে বণিকদের সমস্যার মূলে- বহুধা বিভক্ত নানা দল- উপদলের অবসান তথা জোর যার মুল্লুক তার এই জঙ্গলের নীতির বদলে সমস্ত উপদল- গোত্রগুলোকে একত্রিত করে একচ্ছত্র শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন; আর মানুষ হিসাবে, দাসপ্রথা সহ বিভিন্ন প্রথার অবসান চেয়েছিলেন। কিন্তু, এই চাওয়া তখনকার সমাজ- ব্যবস্থার বাস্তবতায় অপরিহার্য চাহিদা ছিল, এবং মুহাম্মদ সা. ছাড়াও অনেক আরব এ ধরণের স্বপ্ন দেখেতেন।

-> মুহাম্মদ সা. নতুন ধর্ম প্রচারের আগে নানাভবে তাঁর সাধ্যমত সে চেস্টা চালিয়েছেন। হিলফুল ফুযুল এ ধরণের একটি চেস্টা।

-> একসময়ে তিনি বুঝতে পারেন, একটা বড় ধরণের পরিবর্তন দরকার। খাদীজার সাথে বিবাহের পর তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা আসলে, তিনি গভীর ভাবে অনুসন্ধান করতে থাকেন- উপায় সম্পর্কে।

-> ৪০ বছর বয়সে গিয়ে তিনি নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

->আরবদের জন্য ইসলাম ধর্ম কোন প্রোপার নাউন নয়, সেখানে এটা মানে শান্তির ধর্ম বুঝায়।

->মুহাম্মদ সা. স্বভাবতই বণিকদের ও দাসশ্রেণীর সাড়াই পান সর্বাগ্রে।

->তিনি কোরআনের কোন লিখিত ফর্ম হাজির করেননি, যা করেছেন তা হলো- বিভিন্ন ঘটনায় তাতক্ষণিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, ফয়সালা, নতুন মত প্রচার। এ সমস্তই করেন ঐশী বানীর নাম করে।

সাতঃ

কোরআন নিয়ে কিছু কথাঃ

->কোরআনের সুরাসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত- মাক্কী ও মাদানী।

->মক্কায় প্রচারিত সুরাসমূহ মাক্কী, মদিনায় প্রচারিত সুরাসমূহ মাদানী।

->মাক্কী সুরাসমূহে প্রধানত আল্লাহর গুন, আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর মহিমা এসবই বর্ণিত।

->মাদানী সুরাসমূহে ইসলামী শাসনব্যবস্থা পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়, মুমিনদের করণীয় বা আচার- আচরণ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। সেইসাথে এই সুরাগুলিতেই ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে কথা বলা হয়েছে, এবং প্রাচীণ ইতিহাস তথা ঈসা(যীশু), মুসা(মসেস) এর ঘটনাসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

->মুহাম্মদ সা. মক্কায় থাকাকালীন প্রধানত মক্কার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করেন। ফলে, সেসময় তাঁকে বহু ঈশ্বরবাদের বিপরীতে আল্লাহর মহিমা তথা একত্ববাদ প্রচারেই ব্যস্ত থাকতে হয়।

->মদীনায় অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে তাঁকে ইসলামি শাসনব্যবস্থা কায়েমের চেস্টায় লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। ফলে, এসময় তিনি এসময় তাঁর অনুসারীদের ইসলামী শাসন কাঠামো কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন, এবং সেই সাথে তাঁর অনুসারীদের বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্নে তিনি মুমিনদের আচার- আচরণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে থাকেন।

->মদীনাতেই তিনি ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের মোকাবেলা করেন বেশী। যেহেতু, ইসলামকে ঐ দুই ধর্মের ধারাবাহিকতায় আসা ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করেন- সেহেতু- খৃস্টান ও ইহুদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের তথা বিভিন্ন প্রচারণার উত্তর তাঁকে এসময় দিতে হয়।

->মুহাম্মদ সা. কোরআনের কোন লিখিত রূপ বা একিউমুলেটেড রূপ হাজির করেননি।

->বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে তিনি ইসলাম প্রচারে ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন, বিভিন্ন কথা তথা বক্তব্য প্রচার করেন। এই বক্তব্য প্রচারের সময় একটা বড় অংশকে তিনি ঐশী বা আল্লাহর ওহী হিসাবে প্রচার করেন।

->সমসাময়িক জ্ঞান- বিজ্ঞানের নানা বিষয় আল্লাহর মহিমা প্রচারে কোরআনে স্থান পায়।

->এ ধরণের ওহীসমূহ সেসময় তাঁর স্ত্রীগণ ও সাহাবীরা মুখস্থ করতেন ও বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ করে রেখে দিতেন।

->খলিফা ওসমানের বৃদ্ধাবস্থায় কোরআন লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এবং তখন থেকে আমরা লিপিবদ্ধ একটি কনসলুটেড কোরআন পাই।

->আজ যে অবস্থায় আমরা কোরআন পাই (হরফের ব্যবহার ব্যতিরেকে) তা খলিফা ওসমানের অবদান।

->কোরআনের এই সুরা সংখ্যা, সুরা/ আয়াতসমূহের ক্রম- সবই ওসমানের সিদ্ধান্তানুযায়ি(বিবি হাফসা ও অন্যান্য কিছু সাহাবির ভূমিকাও ছিল) হয়েছে।

->কোরআনের প্রয়োজনীয় আয়াত তথা সুরা সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার পর বাদবাকি সব আয়াতসমূহ ওসমানের নির্দেশে ধ্বংস করে ফেলা হয়। অবশ্য যুক্তি দেয়া হয়- ওসব আসলে আল্লাহর ওহী নয়, অনেকের মনগড়া।

-> ওসমানের নেতৃত্বে এই সংকলন কর্মে কিছু আয়াতের পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব নয়। ইসলামী চিন্তাবিদেরা এ ধরণের কিছু কিছু পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেন; যেমন আরবী ভাষারীতির পরিবর্তন।

->ওসমানের প্রতি আল্লাহর কোন ওহী নাজিলের কোন কথা কেউ কখনও দাবি করেননি। ফলে, কোরআন সংকলনের কাজটিও আল্লাহর নির্দেশে করেছেন এমন কথা তিনি নিজেও দাবি করেননি।

->এই প্রয়োজনীয়তা তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনার স্বার্থে অনুভব করেছিলেন।

->আলী ও ওসমানের মধ্যকার বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধের কথা সকলেই জানে। এই মতবিরোধ কোরআন সংকলনের ক্ষেত্রেও ছিল।

->মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাহাবীদের যেমন যা যা জানাবোঝা ছিল, তথা সেসময় আরব অঞ্চলে যেসব ধারণাসমূহ বিরাজ করতো সেসব থেকেই আলোচনা কোরআনে পাওয়া যায়।

->সেসময়ের আরব অঞ্চলের মানুষের জানাবোঝা ও ইমাজিনেশনের বাইরের এমন কিছুই কোরআনে স্থান পায়নি।